25 JUL 2017

সমকাল | মঙ্গলবার ২৫ জুলাই ২০১৭ ১০ শ্রাবণ ১৪২৪ | মুক্তমঞ্চ | ১৭

পরীক্ষার ফল কেন প্রশ্নবিদ্ধ

আমিরুল আলম খান

এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গড় পাসের হার ও জিপিএ ৫ দুটিই কমে গেছে। আর তাতে দেশব্যাপী সমালোচনার ঝড় বইছে। গত বছর পাসের হার ছিল ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ; এবার হয়েছে ৬৮ দশমিক ৯১ শতাংশ। এবার জিপিএ ৫ পেয়েছে ৩৭ হাজার ৯৬৯ জন। গত বছর জিপিএ ৫ পেয়েছিল ৫৮ হাজার ২৭৬ জন। গত বছরের চেয়ে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ২০ হাজার ৩০৭ জন (প্রায় ৩৫ শতাংশ)।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, 'সঠিক মূল্যায়নের ফলে এবার পাসের হার কমেছে।' আর ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হওয়াই গুরুত্বপূর্ণ; পরীক্ষার পাসের হার বিবেচ্য নয়।'

এবার কুমিল্লা বোর্ডে পাস করেছে মাত্র ৪৯ দশমিক ৫২ শতাংশ পরীক্ষার্থী। এই হার দেশে সর্বনিম্ন। উচ্চ মাধ্যমিক ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লা বোর্ডের ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং 'ফল কেন খারাপ হলো' তা জানতে চেয়েছেন।

পাবলিক পরীক্ষায় পাসের উচ্চ হার নিয়ে সমালোচনার অন্ত নেই। অনেকের মতে, পাসের হার যতই বেশি হোক; শিক্ষার মান নিম্নমুখী। কেউ কেউ মনে করেন, এ দেশে পাসের হারে যে বন্যা চলছে, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। কোনো দক্ষতা ছাড়াই লাখ লাখ ছেলেমেয়ে শুধু পাসই করছে না; তাদের জিপিএ এত উঁচু যে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

গত পাঁচ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের সামগ্রিক ফলে অসামঞ্জস্য তত প্রকট নয়। ২০১৩ সালে ৭১ দশমিক ১৩; ২০১৪ সালে ৭৫ দশমিক ৭৪; ২০১৫ সালে ৬৫ দশমিক ৮৪; ২০১৬ সালে ৭২ দশমিক ৪৭ এবং এ বছর ২০১৭ সালে ৬৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, সর্বোচ্চ গড় পাসের হার ছিল ২০১৪ সালে ৭৫ দশমিক ৭৪ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন এ বছর ৬৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ, সর্বোচ্চ পার্থক্য ১০ শতাংশের নিচে। কিন্তু প্রতি বছর কোনো না কোনো বোর্ডে ফল অস্বাভাবিক খারাপ করায় অন্যান্য বোর্ডের গড় ফলের ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ২০১৫ সালে এমন অস্বাভাবিক ফল করেছিল যশোর বোর্ড; এ বছর করেছে কুমিল্লা বোর্ড।

এ বছর 'সঠিক মূল্যায়ন' এবং বহু নির্বাচনীতে ১০ নম্বর কমিয়ে তা সৃজনশীলে যুক্ত করা ছিল শিক্ষা বোর্ডগুলোর মূলনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কুমিল্লা বোর্ডের অস্বাভাবিক ফল বিপর্যয়। ইংরেজি, পদার্থবিদ্যা বা উচ্চতর গণিতে ফল খারাপ হওয়ায় এবারের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলে তার প্রভাব পড়েছে।

মূল্যায়নের সঠিক পদ্ধতি কী, তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে প্রান্তিক নম্বর যোগ না করার সিদ্ধান্ত বোর্ডগুলো গত মাধ্যমিক পরীক্ষা থেকে চালু করেছে। আর বহু নির্বাচনীতে নম্বর আরও কমিয়ে আনার দাবি জোরদার হচ্ছে দেশে। অনুমান করা যায়, বহু নির্বাচনীতে নম্বর যদি ২০-২৫-এ নামিয়ে আনা হয়, তাহলে পরীক্ষার ফলে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। অনেকে আবার ব্যবহারিক পরীক্ষায় দুর্নীতি বন্ধে ব্যবহারিক পরীক্ষা তুলে দেওয়ার কথা বলছেন। এটা হবে খুবই আত্মঘাতী। বরং বিজ্ঞান শিক্ষাকে আরও বেশি ব্যবহারিক করে তোলা জরুরি। সে ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষা সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

লক্ষণীয় বিষয়– পাসের হার বাড়লেও সমালোচনা, কমলেও সমালোচনা। অর্থাৎ পরীক্ষার ফলের ওপর নাগরিকদের বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে। এটি খুবই খারাপ লক্ষণ। আমাদের অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠভাবে সমালোচনা করতে হবে। আর যখন-তখন নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে।

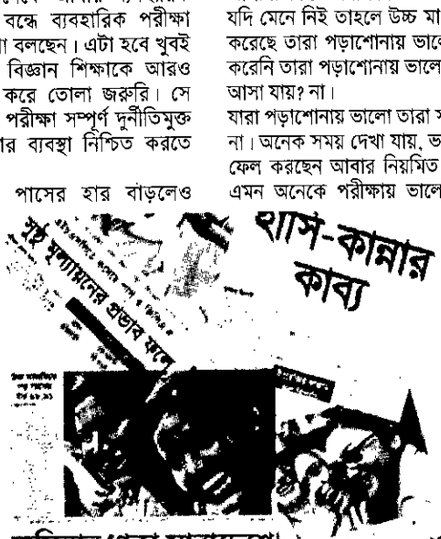

সবচেয়ে বড় কথা, আমরা সিলেবাস-কারিকুলাম প্রণয়ন, ভালো পাঠ্যবই রচনা এবং পঠন-পাঠনে গুণগত কোনো উন্নতি সাধন করতে পারিনি। দেশে কোচিং বাণিজ্যের সীমাহীন প্রসার গোটা জাতির নৈতিকতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে। সরকার চাইলে একদিনেই সব কোচিং সেন্টার বুলডোজার দিয়ে উপড়ে ফেলতে পারে। আর তাহলেই দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সত্যিকারের উন্নতি সম্ভব হবে।

দেশের সব নাগরিক তথা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক; সরকার-প্রশাসন, মিডিয়া সম্মিলিতভাবে প্রয়াসী হলেই কেবল এ সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

সাবেক চেয়ারম্যান, যশোর শিক্ষা বোর্ড
amirulkhan7@gmail.com

উত্তরপত্র মূল্যায়নে কড়াকড়ির ফল!

শরিফুজ্জামান শরিফ

দশটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হয়েছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার ফল বিপর্যয়ের খবর নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। দেখা গেছে, গত দশ বছরের তুলনায় এবারে পাসের হার, জিপিএ প্রাপ্তির হার এবং এক সময় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শতভাগ পরীক্ষার্থী পাস করত তার সংখ্যা কমেছে। অনিবার্যভাবে তাই আলোচনাটা বেশি।

পরীক্ষা আসলে একটা ছাকন পদ্ধতি। যারা পড়াশোনায় ভালো, আর যারা ভালো নয়, তাদের আলাদা করতে পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। এটা যদি মেনে নিই তাহলে উচ্চ মাধ্যমিকে যারা পাস করেছে তারা পড়াশোনায় ভালো আর যারা পাস করেনি তারা পড়াশোনায় ভালো নয়, এই সিদ্ধান্তে আসা যায়? না।

যারা পড়াশোনায় ভালো তারা সব সময় উত্তীর্ণ হন না। অনেক সময় দেখা যায়, ভালো ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করছেন আবার নিয়মিত পড়াশোনায় দুর্বল এমন অনেকে পরীক্ষায় ভালো করেন। ক্লাসের একজন দুর্বল শিক্ষার্থী যদি কঠোর পরিশ্রম করে পরীক্ষায় ভালো করেন, আমরা খুশি হই আবার একজন ভালো শিক্ষার্থী যদি পরীক্ষায় খারাপ ফল করেন, আমরা কষ্ট পাই। তবে খারাপ করাটা যদি অনেকের বেলায় ঘটে, তাহলে কেবল কষ্ট পাওয়ার ভেতরে আমাদের দায়িত্ব শেষ হয় না। আমাদের দায়িত্ব হয় তার কারণ খুঁজে বের করা, পরে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এবার পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন একটু কড়াকড়ি করা হয়েছে। তার এই যুক্তি যদি গ্রহণ করি তাহলে একাধিক প্রশ্ন ওঠে। প্রথমত, আগের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে শিথিলতার কথা কি মন্ত্রী স্বীকার করছেন? যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে সেটা কি ঠিক ছিল? আমাদের শিক্ষার মান নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে নানা প্রশ্ন উঠছে। দেখা যাচ্ছে, খুব ভালো ফল করেও অনেকে ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারছেন না, পারেননি। তাহলে আমরা এবার মন্ত্রীর এই ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝতে পারছি শিথিলতার কারণে অনেক দুর্বল শিক্ষার্থীকে আমরা ভালো ফল করতে দেখেছি। এর মাধ্যমে পাসের হার বা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। আম[illegible] পারি, আমাদের দেশে এই সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পাস। কিন্তু এই সফলতা আমাদের ভবিষ্যতে কতটুকু কাজে আসবে, প্রতিযোগিতায় এরা কতটুকু শক্তি নিয়ে টিকে থাকবে, সেই প্রশ্ন করাই যায়।

এর রাজনৈতিক উপযোগিতা থাকলেও সামাজিক কোনো উপযোগিতা নেই।

আর এই প্রশ্নটি করব শিক্ষামন্ত্রীকে। জবাবটা কিন্তু তাকেই দিতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর এই তথ্যটির আরও একটা সামাজিক প্রতিক্রিয়ার দিক আছে। আমরা অনেকে একমত হবো, আগের পরীক্ষাগুলোতে যারা পাস করেছেন, ভালো ফল করেছেন, তাদের অনেকে এবারের মতো যদি উত্তরপত্র কঠোর মূল্যায়ন হলেও ভালো ফল করতেন। কিন্তু মন্ত্রীর দেখানো এই কারণটি তাদের বা তাদের পরিবারের জন্য কিছুটা লজ্জা দেবে। মন্ত্রী মুড়ি-মুড়কি এক করে ফেলেছেন, যা ঠিক হয়নি।

এবার আসি দ্বিতীয় কারণটির দিকে। যা শিক্ষাবিদ-গণমাধ্যম থেকে জানতে পারছি। কুমিল্লা বোর্ডে ফল বিপর্যয় ঘটেছে। এর আগে এসএসসিতেও এটা হয়েছে। এর কারণ খুঁজে বের করতেই হবে। সঙ্গে প্রতিকারেরও ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী যদি এটা বলতেন আমরা আশ্বস্ত হতাম। তিনি সেটা না বললেও তাকে এই কাজটা করতেই হবে।

এবার ইংরেজিতে ফেল করেছে প্রায় ২২ শতাংশ, যা পুরো ফলের হিসেবে প্রভাব ফেলেছে। গত বছর যশোর বোর্ডেও এসএসসিতে ফল বিপর্যয় ঘটেছে। সেই বিপর্যয়ের কারণ ছিল ইংরেজিতে দুর্বলতা। আমরা অসুখের উৎস জানতে পারছি। এখন চিকিৎসা দিতে হবে।

শুদ্ধ করে আমাদের মাতৃভাষা শেখার ও চর্চার দরকার আছে আবার ইংরেজিও দরকার হয়। আমাদের গণিত শিখতে হয়, বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। না হলে আমরা পিছিয়ে পড়ি। জগৎ থেকে, সভ্যতা থেকে, পৃথিবী থেকে। অথচ এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের ভীতি আছে, অনীহা আছে, সুযোগের অভাব আছে। গ্রামের কলেজ বা স্কুলে খুব বেশি ভালো শিক্ষক নেই। কেন নেই? উত্তর হলো– পাওয়া যায় না, যেতে চান না, গেলে থাকেন না।

সব কথা ঠিক। আবার এর নিরসন ব্যক্তি চাইলে পারে না। সরকার চাইলে পারে। সরকারকে সেটা চাইতে ও পারতে হবে। শুধু মানুষের আয়, গড় আয়ু, সড়কে বাতি, উড়াল সেতু সমাজকে আলোকিত করে না। সমাজ থেকে অন্ধকার তাড়াতে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে রোগ খুঁজে পেয়েছি, তার চিকিৎসা করতে হবে। ফল প্রকাশের পরে সংবাদপত্র, টেলিভিশন আর সামাজিক মাধ্যমে ভালো ফল করা শিক্ষার্থীর যে বর্ণিল হাসি দেখছি, মানসম্মত শিক্ষায় আলোকিত সবার বর্ণিল হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ুক শহরের গণ্ডি পেরিয়ে গ্রামে, জনপদে।

সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর